কিয়ের্কেগার্ডের দর্শনে 'ফিলিস্তিন' কিংবা আপনারে চিনতে পারলে রে.............

॥ রাহমান নাসির উদ্দিন ॥

ও যার আপন খবর আপনার হয়না
ও যার আপন খবর আপনার হয়না
একবার আপনারে চিনতে পারলে রে
যাবে অপরে (অচেনারে) রে চেনা[1] ॥

এখানে গানের গুণে 'আপন' মানে 'নিজ' এবং মানের গুণে 'অপর' মানে 'পর' । অন্যদিকে, ভাবের গুণে 'আপন' হচ্ছে 'নিজের অস্তিত্ব' আর স্বভাবের গুণে 'অপর' মানে 'অপার পর' বা 'পর দুনিয়া'। নিজগুণে বিখ্যাত বাংলার বাউল ফকির লালন শাহ্-র এ 'আপন' 'পর' ও 'অপর', কালের গুণে ডেনিস দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্ডের (১৮১৩-১৮৫৫) দার্শনিক তত্ত্ব 'অস্তিত্ববাদ'। 'আপন' মানে 'স্বস্তিত্ব' আর 'অপর' মানে 'স্বহীন'। আরো খোলাসা করে বললে, 'নিজের অস্তিত্ব' ছাড়া (আপন ছাড়া) , অন্য সবকিছুই 'অপর'। সমাজ-সময়-সমকাল-রাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্ম-দর্শন-মুল্যবোধ-সামাজিক কাঠামো-সামাজিক আচার-আচরণ-রীতিনীতি-পরিবেশ-প্রতিবেশ প্রভৃতি সবকিছুই 'অপর'। হক কথায়, প্রথা পরিক্রমায় আবদ্ধ বিবেকহীন[2] বেবাক দুনিয়া'ই অপর। বাংলার এ ভাব দর্শনের মোদ্দা কথা হলো , যে নিজেকে (আপনকে) চিনতে পারেনা , সে তার সময়, সমাজ ও প্রচলিত সামাজিক মুল্যবোধকে বুঝতে পারে না । নিজের অজান্তেই সে সমাজের প্রচলিত নিয়ম-নীতি ও প্রথা-পরিক্রমায় চালিত এবং পালিত হয় । অস্তিত্ববাদি দর্শনের পরিভাষায় একে বলা হয় 'ফিলিস্তিন'[3] (Philistin) | আর যখনই একজন মানুষ নিজেকে সত্যিকার অর্থে আবিষ্কার করে যে , সে কে? এবং কিভাবে সে সে হয়েছে ? কেন সে সে হয়েছে ? এবং কোথায় সে যাবে ? তখনই সে নিজের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করে । সাথে সাথে গোটা 'অপর' তার কাছে 'অ-পর' হয়ে যায় । অর্থাৎ 'আপন' হয়ে যায় । সব আবিষ্কার বা পরিষ্কার হয়ে যায়। তখনই সে হয়ে উঠে 'অস্তিত্বাবাদি' দর্শনের আরেক স্তর 'এস্থেটি'(aesthete) । অর্থাৎ 'অস্তিত্ববাদি' দর্শনের তত্ত্বানুযায়ী যে 'আপন'কে চিনতে পারে না, তার কাছে গোটা 'অপর'টাই পর থাকে । কিন্তু যখনই সে 'আপন' কে চিনতে পারে, তখনই, বেবাক 'অপর' আর 'পর' থাকেনা 'আপন' হয়ে উঠে ।

প্রায় অনক্ষর মহাত্মা লালন ফকির (১৭৭৪-১৮৯০) যে মহান দর্শনের বয়ান করেছেন বাংলার এক অজপাড়াগায় (কুষ্টিয়া জেলার ছেউড়িয়া গ্রামে) বসে, ঠিক তারই যেন পাশ্চাত্য অনুবাদের সাহেবী নাম 'অস্তিত্ববাদ'। বাঙালির চিরায়ত স্বভাবানুযায়ী জিহ্বা লম্বা করে, গলা বাড়িয়ে বলতে পারি বাউলা বাউলের 'গান'-এর সাহেবী বাবুগিরির নামই হচ্ছে 'অস্তিত্ববাদ'। যার আচল ধরে বিশ্বব্যাপি খেতাব কুড়িয়েছেন , দার্শনিকের তকমা নিয়ে রাষ্ট্র হয়েছেন সোরেন কিয়ের্কেগার্ড, ফ্রেডরিক নীটশে(১৮৪৪-১৯০০) কার্ল ইয়েসপার্স (১৮৮৩-১৯৬৯) , গ্যাবরেল মার্সেল(১৮৮৯-১৯৭৩), মার্টিন হাইডেগার(১৮৮৯-১৯৭৬) , আলেবেয়ার ক্যামু ও জ্যা-পল সাঁত্রে(১৯০৫-১৯৮০) প্রমুখ । বাংলার কোর্তার আস্তিনে পয়দা হওয়া এ 'লোক-দর্শন' পাশ্চাত্য বাবুগিরির স্যুটের পকেটে ঢুকে হয়ে উঠেছে যুগান্তকারী দর্শন 'অস্তিত্ববাদ'। বাউলা লালনের এ 'সুরেলা ভাব' মাওলা কোন মাজেজায় দিনেমার কিয়ের্কেগার্ডের জবানে দিলেন, বিলকুল বেমালুম । যদিও এ দাবি করার দুর্মতি আমার নাই যে, সোরেন কিয়ের্কেগার্ড লালনের 'ভাব' চুরি করে তার দর্শন-শরীরের ভুড়ি বানিয়েছেন। তবে, মহাত্মা লালনজি যে, এ মহাবিদ্যা[4] প্রয়োগ করেননি , তা হলফ করে বলতে পারি । কেননা, উনবিংশ শতকের দশের দশকে লালনজি সুরের ভাবে যে 'তত্ত্ব' পয়দা করেছেন তা'ই উনবিংশ শতকের চল্লিশের দশকে ডেনমার্কের কিয়ের্কেগার্ডের চিন্তা-জাত হয়ে 'অস্তিত্ববাদে'র রূপ ধারণ করেছে। বর্তমান প্রবন্ধের মুল বিষয় লালন ফকিরের গানের সাথে কিয়ের্কেগার্ডের দর্শনের সম্পর্ক নির্ণয় নয়। 'অস্তিত্ববাদ' বিষয়ে কিয়ের্কেগার্ডের 'ফিলিস্তিন' তত্ত্ব 'সহজিয়া' পদ্ধতিতে বোঝার জন্য লালনের গানের তুলনার মাধ্যমে এ তত্ত্বের একটা দেশিকরণের প্রচেষ্টা । সাথে উপরি পাওনা হচ্ছে , কিয়ের্কেগার্ডের দার্শনিক আলোচনাকে তত্ত্বের জটিল আকাশ থেকে বোধের সরল জমিনে আমন্ত্রণ জানানো। বর্তমান নিবন্ধে 'অস্তিত্ববাদি' দর্শনের স্রষ্ঠা

সোরেন কিয়ের্কেগার্ডের দর্শন চিন্তায় ‘ফিলিস্তিন’ বিষয়ে সবিস্তর বিশ্লেষনাত্ম আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ‘ফিলিস্তিন’-উত্তর কিয়েকেগার্ড বর্ণিত মানুষের জীবনের তিনটি স্তর বা পর্যায়ের অনুপুঙ্খ বয়ান দেয়া হয়েছে। সাথে তোফা আলাচনা হিসাবে রইলো , এ তত্ত্বের আয়নায় নিজেদের ‘চেহারা-মোবারকটা’ একবার দেখে নেয়ার চেষ্টা করা ।

॥ পয়েলা ॥

মুল আলোচনায় যাওয়ার আগে এ ‘ফিলিস্তিন’ তত্ত্বের স্রষ্টা সোরেন কিয়ের্কেগার্ডের সাথে একটু পরিচিত হওয়া যাক । তত্ত্বালোচনার অন্দর মহলে যাওয়ার আগের সদরের ব্যাপার-স্যাপার সেরে নেয়া ভালো। এতে আত্মীয়তা পাকাপোক্ত হয়। ফলশ্রুতিতে বোঝাপড়াটা ভালো হয় । আর দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় বোঝাপড়াটা ভালো হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। ১৮১৩ সালের ১৫মে ডেনমার্কের কোপেন হেগেনে কিয়ের্কেগার্ডের জন্ম। পুরো নাম সোরেন আবি কিয়ের্কেগার্ড ওরফে সোকি[৫] । স্ক্যান্ডিন্যাভিয়ার সংস্কৃতির পীঠস্থান কোপেনহেগেনের বিত্তশালী ব্যবসায়ী মাইকেলে পেডারসন কিয়ের্কেগার্ডের দ্বিতীয় স্ত্রীর সপ্তম এবং শেষ সন্তান আমাদের সোকি। স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসার এবং পারিবারিক আবেগীয় উত্তাপের অভাবের মধ্যে মানুষ হলেও স্বভাবের মধ্যে ছিলো জ্ঞানার্জনের প্রতি সোকির প্রচন্ড ঝোক। পিতার কৃত পাপের[৬] প্রায়শ্চিত্য করতে গিয়ে সোকি পিতার মৃত্যপর্যন্ত (১৮৩৮ পর্যন্ত) রুগ্ন-ভগ্ন-বিষন্ন-অবসন্ন-নিস্তরঙ্গ-নিঃসঙ্গ জীবন কাটান। ইতোপুর্বে কিছুটা দার্শনিক-আলোর ছটা থাকলেও প্রকৃতক্ষে ১৮৪০ সালের পরে শুরু হয় কিয়ের্কেগার্ডের জীবনের দার্শনিক পর্যায় । জীবনের যাপিত অভিজ্ঞতার আলোকে এবং অফুরন্ত অধ্যয়নের বদৌলতে সোকি একটি সমৃদ্ধ মানস-সম্পন্ন মানুষে পরিণত হন । পার্শ্ববর্তী দেশ জার্মানের দর্শন চিন্তার ও দার্শনিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের সুযোগ্য বাহক সভ্যতার ত্রাতা হিসাবে পরিচিত হেগেল এবং কান্টের[৭] প্রবল প্রতাপে দাশনিক দুনিয়ায় যখন ভাববাদি, বুদ্ধিবাদি, বস্তুবাদি এবং প্রকৃতিবাদি দর্শনের রৈ রৈ অবস্থায় একচেটিয়া চিন্তাধিপত্য তখন সোকি সম্পুর্ণ ভিন্ন-চিন্তা-জাত হয়ে ভিন্ন দৃষ্টির অথচ অত্যন্ত মৌলিক এবং স্বতন্ত্র দর্শনিক চিন্তা-প্রসুত ‘অস্তিত্ববাদ’ তত্ত্বের জন্ম দেন। তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ-গ্রন্থ রচনা করেন । অনবরত-অক্লান্ত-অফুরন্ত লেখালেখির মাধ্যমে তিনি ক্রমান্বয়ে তাঁর দার্শনিক চিন্তার বিকাশ ঘটান । তার বিখ্যাত গ্রন্থসমুহের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য-বহুল পরিচিত-বহুল পঠিত গ্রন্থের নাম হচ্ছে The Journal (1834-55), The concept of Irony (1841), Either/Or (1843), Fear and Trembling (1843), The concept of Dread (1844) , Stages on Life’s Way (1945) , Concluding Unscientific Postscript (1947) Christian Discourses (1848) , The Sickness Unto Death (1849), The Individuals (1949), For Self-examination (1951) and God’s Unchangeableness (1955) পড়তে[8]। তন্মধ্যে সোকি মূলত Either/Or (1843) এবং The Sickness Unto Death (1849) -গ্রন্থে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ‘ফিলিস্তিন’ এবং এই জীবনের উত্তরণ-পদ্ধতি নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করে তার যুগান্তকারি দার্শনিক তত্ত্ব পয়দা করেন। তিনি মানুষের জীবনের তিনটি স্তরের বর্ণনা দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের সরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করেন। এবং একটি তাত্ত্বিক কাঠামোতে মত্ত থেকে কিয়ের্কেগার্ড দাশনিক-দুনিয়ায় ‘অস্তিত্ববাদ’ নামের একটি যগান্তকারী দর্শনের অস্তিত্ব সৃষ্টি করে । মোদ্দা কথায় আসা যাক। পরের টীকা এবং অপরের টীকি হাওলাদ করে কিয়ের্কেগার্ডের ব্যক্তি জীবনের সবক না নিয়ে আমরা তাঁর তাত্ত্বিক-দর্শন কিংবা দার্শনিক তত্ত্বের দরবারে হাজির হই। তবে, সোকি পয়দা-কৃত ‘ফিলিস্তিন’ তত্ত্ব বোঝার উসিলায় আমরা ‘অস্তিত্ববাদের’ সামান্য তাত্ত্বিক বয়ান শুনতে পারি।

॥ দোসরা ॥

এক ঐতিহাসিক পটভুমিকায় ‘অস্তিত্বাবাদি’ দর্শনের জন্ম । আধুনিক যুগ হলো যান্ত্রিক সভ্যতার যুগ । চারদিকে শুধু বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার জয়গান । বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারে মানুষ হয়েছে ধন্য কিন্তু তার সাথে হারিয়েছে নিজেকে , নিজের ব্যক্তিসত্তাকে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাকে। প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভুত্ব বিস্তার করেছে মানুষের উপর । মানুষ হয়েছে যন্ত্রের ক্রীতদাস । তাই , মানুষ নিজের অস্তিত্ব ,স্বাধীনতা এবং মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন না হয়ে বেশি সচেতন হয়েছে বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্বন্ধে- অস্তিত্বের চেয়ে তার কাছে অনেক বেশি প্রিয়-মুল্যবান-গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে যন্ত্র,শিল্প, কারখানা, গাড়ি, রেড়িও , টেলিভিশন প্রভৃতি[৯] । অন্যান্য সব কিছুর চেয়ে নিজের অস্তিত্বকে গুরুত্বায়নের ভিত্তিতে ভাববাদি এবং প্রকৃতিবাদি দর্শনের এক প্রকার তুড়াই-বিরোধীতা করে অস্তিত্ববাদি দর্শনের জন্ম ।

দাস যুগের গ্রীস দার্শনিক প্লেটোর মতানুযায়ী বস্তুজগৎ বাস্তব অস্তিত্বশীল নয়। বুর্জোয়া যুগের জার্মান দার্শনিক হেগেল চরম ভাবকে বলেছেন যথার্থ সত্য বলে । আবার তিনি ব্যক্তি সত্তার অস্তিত্বকে দেখেছেন সামগ্রিক ও সামাজিক সত্তার অংশ বা অধিনস্থ রূপে । দর্শনের ক্ষেত্রে এ ধরনের সার্বিকতা এবং সার্বজনীনতার বিপরীতে অস্তিত্ববাদি দর্শনিক চিন্তার সূত্রপাত । অস্তিত্ববাদি দার্শনিকরা প্রয়াসি হলেন চরম ভাববাদি, যুক্তিবাদি ও সামগ্রিক তথা সার্বিকতাবাদি দর্শনের বিরুদ্ধে আপাত সত্য, ভাবাবেগ ও ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বকে আশ্রয় করে দর্শনের জগতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করতে । একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করতে । তাদের মতে যুক্তির জাল বুনে দার্শনিকরা শুধু কথা মালাই তৈরী করতে পারেন, কিন্তু তাতে মানুষের কোন মঙ্গল সাধিত হয়না , বা হতে পারে না । এ অলীক ও অবাস্তব তত্ত্বানুসন্ধানের পরিবর্তে দার্শনিকদের দায়িত্ব হওয়া উচিত মানুষকে লক্ষ হিসাবে গ্রহণ করা ,মানুষের বাস্তব সমস্যাবলি সমাধানের আত্ম নিয়োগ করা[১০] । এক্ষেত্রে ত্রাতার ভুমিকা এবং অস্তিত্ববাদি দর্শনের জনকের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন সোরেন কিয়েৰ্কে গার্ড । যদিও অস্তিত্ববাদি দর্শনকে জ্ঞানকান্ডের একটি সমৃদ্ধ শাখায় রূপান্তর করেন জ্যাঁ-পল সাত্রে, কিন্তু সোরেন কিয়ের্কেগার্ডকেই মুলত 'অস্তিত্ববাদি' দর্শনের জনক বলা হয়[১১] । কেননা খোদ 'অস্তিত্ববাদি' দর্শনের মহারাজা এবং ফরাসি সভ্যতার বিবেক তকমাধারী মহাত্মা জ্যাঁ-পল সাত্রেও কিয়ের্কেগার্ডকে এ তত্ত্বের গুরু হিসাবে মান্য করেছেন । কিয়ের্কেগার্ড উপলব্দি করেছিলেন যে, কান্টের দর্শন ও হেগেলের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সবই মানষের ব্যক্তিক জীবনে অর্থহীন । কেননা, ব্যক্তির সিদ্ধান্তের উপরেই ঘটনাবলীর গতি প্রকৃতি নির্ভরশীল । তাই , সবকিছু বিচার-বিবেচনা-বিশ্লিষনের ক্ষেত্রে মানুষের অস্তিত্বশীল জীবনকেই গুরুত্ব দিতে হবে । অন্যসবকিছু বিদ্যমান একথা সত্য কিন্তু মানুষের জীবনই একমাত্র অস্তিত্বশীল এ কথা ধ্রুব সত্য । কিয়ের্কেগার্ড মানুষের এ অস্তিত্বশীল জীবনকে গুরুত্বায়ন করেই তার এ যুগান্তকারি 'অস্তিত্ববাদ' (Existentialism) দার্শনিক তত্ত্ব প্রসব করেন[১২] । যা পরবর্তীতে , ইয়েসপার্স , মার্সেল , নীটশে, হাইডেগার প্রমুখের হাতে লালিন-পালিত হয়ে জ্যাঁ-পল-সাত্রের হাতে পুর্ণ যৌবন লাভ করে । মজার ব্যাপার হচ্ছে , যৌবন লাভ করে , তা আর কোনভাবেই বৃদ্ধ হচ্ছে না । সময় যত গড়াচ্ছে , বয়স যত বাড়ছে , এর রূপ যৌবন ততই বাড়ছে । কেবলই বাড়ছে। তাজ্জব ব্যাপার ।

॥ তেসরা ॥

এবার একটু নড়ে চড়ে বসা যাক । দর্শনের ওজনদার তাত্ত্বিক আলোচনার অন্দর মহলে প্রবেশ করা যাক । কিয়ের্কেগার্ড বলেন মানুষের জীবনের তিনটি স্তর লক্ষ করা যায় । ভোগী স্তর (aesthetic stage) , নৈতিক স্তর (Ethical stage) এবং ধর্মীয় স্তর (Religious stage)। জীবনের এ তিনটি স্তরের কথা যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করে কিয়ের্কেগার্ড তাঁর 'অস্তিত্ববাদি' দর্শনের তত্ত্ব আবিস্কার করেন । আর এ তিনটি স্তরকে বোঝার জন্য কিয়ের্কেগার্ড তাঁর 'ফিলিস্তিন' প্রত্যয়টি পয়দা করেন । কিয়ের্কেগার্ড মুলতঃ অন্ধ ধর্মবিশ্বাস থেকে যারা খৃষ্টান হিসাবে দাবি করে , খৃষ্টান বলে পরিচিতি জাহির করে এবং খৃষ্টান ধর্ম চর্চা করে তাদের আঘাত করার প্রয়াসে 'ফিলিস্তিন' শব্দটি ব্যাবহার করেন । কিয়ের্কেগার্ডের মতে, একজন ফিলিস্তিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে সব সময় অসচেতনভাবে সামাজিক মুল্যবোধকে বহন করে, সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা মানসিক রুচিকে লালন করে অর্থাৎ বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে চলমান স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় । একজন ফিলিস্তিন সাধারণভাবে গৃহিত রীতিনীতি ও বিদ্যমান আদর্শকে আকড়ে ধরে । এবং যেহেতু সমাজের অচলায়তনকে ভাঙ্গার কোনে আর্তি সে অনুভব করে না , তাই সে তার পেশা ও পরিবার এবং সাফল্য ও সুখের গন্ডিতেই তৃপ্ত থাকে । তার নিজের ধারনা যে, সে স্বাধীন জীবন যাপন করে , নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়ার ক্ষমতা রাখে এবং নিজের পছন্দ-অপছন্দ বলে একটা ব্যাপার আছে। অবশ্য আপাত দৃষ্টিতে দেখলে তা'ই মনে হয় । মনে হয় যে, সে অনেক বিকল্প বিষয় থেকে তাঁর পছন্দানুযায়ী একটিকে বেঁচে নেয় । কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, আসলে তার সব সিদ্ধান্তই বা সিদ্ধান্ত সমুহের নির্ধারক হচ্ছে সামাজিক ও ঐতিহাসিক শক্তিসমুহ[১৩]। সামাজিকভাবে অচেতন থেকেই সনাতন জীবন পদ্ধতির কাঠামোর ভেতর ঐতিহাসিকভাবে চলনশীল এবং বিশ্বাস-নির্ভর চলমানতায় একজন ফিলিস্তিন তার জীবন পরিচালিত করে। এ কারণেই আপাত দৃষ্টিতে তার নিজের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা তার নিজের- এটা মনে হলেও কখনই তার নিজের সিদ্ধান্তটি সে নিজে নেয় না । কোন সিদ্ধান্তই তার নিজের না । কিন্ত সে সেটা উপলব্দি করতে পারে না । কেননা, সে জানে না যে সে একজন ফিলিস্তিন । কিয়ের্কেগার্ডের এ 'ফিলিস্তিন' তত্ত্ব নিয়ে একখান মস্ত কেতাব লিখেছেন প্রফেসর ইউহানেস । তিনি তাঁর পঠিত-বোধিত জ্ঞানের আলোকে ফিলিস্তিনের একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন । প্রফেসর ইউহানেস বলেন , 'একজন ফিলিস্তিন এ রকম একটি মানসিক স্বস্তি নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে ভোগে যে, তার সমস্ত সিদ্ধান্ত সমুহ সে নিজেই গ্রহণ করে , নিন্তু সে এটা কখনই বোঝতে বা উপলব্দি করতে পারেনা যে কোন এক অজানা-অচেনা শক্তি তাকে দিয়ে তার সব কাজগুলি করিয়ে নেয়। নিজের অজান্তেই সে অন্যের দ্বারা নির্ধারিত সিদ্ধান্ত নিজের সিদ্ধান্ত

বলে গ্রহণ করে । এবং মনে করে যে , সে তার সব সিদ্ধান্ত সে নিজেই নিয়েছে । সে বুঝতে পারেনা , কেননা সে একজন ফিলিস্তিন'[১৪] । কিয়ের্কেগার্ডের এ তত্ত্বের আয়নায় আমরা নিজেদের 'চেহারা-মুবারক'টা একবার পরখ করতে পারি । দাসযুগের দার্শনিক প্লেটোও একবার নিজের এবং নিজের সমসাময়িক মানুষের 'সুরত' পরখ করে বলেছিলেন, আমরা সবাই আসলে ফিলিস্তিন । তিনি কেবল বলেই খালাস হননি তাঁর জগৎ-বিখ্যাত কেতাব 'রিপাবলিক'-এ তাঁর আপন গুরু মহাত্মা সক্রেটিসের জবান দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে , আসলে আমরা সবাই একঅর্থে ফিলিস্তিন[১৫] । মোদ্দা কথায় আসা যাক । কিয়ের্কেগার্ড মানুষের এ 'ফিলিস্তিন' অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ-পন্থা-পর্যায় হিসাবে তিন কিসিমের জীবনের তত্ত্ব বাতলে দেন । প্রথমে 'ভোগী' , পরে 'নৈতিক' এবং অতঃপরে 'ধর্মীয়' । পরবর্তী অধ্যায়ে কিয়ের্কেগার্ডের এ 'জীবন-স্তর' সম্পর্কে বিস্তৃত বয়ান দেয়া হলো ।

॥ চৌঠা ॥

কিয়ের্কেগার্ড তার aesthetical কেতাবগুলো এমন তরিকায় রচনা করেছেন , কিয়ের্কেগার্ডের ধারণা এ কেতাব পাঠ-উত্তর একজন 'ফিলিস্তিন' তার জীবনের অসারত্ব-অচেতনত্ব-তলাহীনত্ব সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত-ধারণা-চিন্তার মুখোশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন । তার নিজের বিশ্বাস ভঙ্গ করে পুনরায় নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন । কিয়ের্কেগার্ডের মতে, যখনই একজন ফিলিস্তিন বুঝতে পারে যে , তার মূল্যবোধ, সিদ্ধান্ত সমূহ এবং তার জীবনের উদ্দেশ্য-ইত্যাদির পেছনে তাঁর নিজের কোন ভূমিকা নেই , সবই প্রচলিত সামাজিক কাঠামোসমূহের আপেক্ষিক ও আকস্মিক চরিত্র দ্বারা নির্ধারিত , তখন তাঁর ভ্রম কেটে যায় । সে সবকিছুর প্রতি নিস্পৃহ হয়ে পড়ে, কারণ তাঁর পছন্দ বা সিদ্ধান্তের কোনটিই চূড়ান্ত অর্থে তার নিজের নয় । কোথাও সে নিজেকে খুঁজে পায় না। সব কিছুই তার কাছে অর্থহীন মনে হয় । কারণ, বাস্তবতায় এমনি তার নিজের স্বভাবের-বাস্তবতায় তার মূল্যবোধ ও কর্তব্য কর্মের কোন অনপেক্ষ মর্যাদা নেই, সব কিছুই অর্থহীন । কোন কিছুকেই আর গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে না[১৬] । নিজের অস্তিত্বের অসারত্ব উপলব্ধিতে তার সব কিছুকেই ফেকাসে মনে হয় । বর্ণিল জীবন বিবর্ণ হয়ে উঠে । হতাশা-নৈরাশ্য তাকে গ্রাস করে । বিষন্নতা-অবসন্নতা তাকে অনুসরণ করে । অকর্মণ্যতা-অনিশ্চতা-অনাড়ম্বতা তাকে ঘিরে ধরে । অস্থিরতা-অস্তিত্বহীনতা তাকে বিচলিত করে । 'ঠিক যে মুহূর্তে একজন ফিলিস্তিন আবিষ্কার করে যে , সে একজন ফিলিস্তিন এবং তার অর্থ কি , সঙ্গে সঙ্গে সে অন্য কিছুতে পরিণত হয় । সে একজন এস্থেটি (aesthete) হয়ে যায়'[১৭] । জীবন সম্পর্কে হতাশা এবং নৈরাজ্য-চিন্তা একজন 'এস্থেটি'কে স্বেচ্ছাচারী করে তোলো। তার কাজ-কর্মে-চিন্তায়-ব্যবহারে-আচরণে-প্রজ্ঞায় সে অনৈতিক এবং বিবেকহীন হয়ে উঠে । জীবনের প্রতি মায়াহীনতা এবং মোহহীনতা তাকে অবিবেচক-অসামাজিক করে তোলে । নিজের অস্তিত্বের অসারতা একজন 'এস্থেটি'কে অস্থিতিশীল করে তোলো । কিয়ের্কেগার্ডের মতে, এটা মানুষের জীবনের প্রথম স্তর । অর্থাৎ অস্তিত্বের চেতনাহীন ফিলিস্তিন অবস্থা থেকে অস্তিত্বের চেতনায় পদার্পনের পর 'এস্থেটি' রূপ ধারণ-এটা মানুষের জীবনে প্রথম স্তর ।

এ স্তরে মানুষ থাকে ভোগ বিলাসে মগ্ন, সমাজ ও অন্যের প্রতি তার কোন দায়িত্ব থাকেনা, তার দৃষ্টি শুধু থাকে নিজের আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দের দিকে, সুখ ও ভোগের দিকে । এ জীবন দায়িত্বহীন , নৈতিকতাহীন, অস্থির , অপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ, উদ্দেশ্যহীন এবং ক্ষণস্থায়ী[১৮] । এ স্তরে কোন সংযম নেই, কোন আত্ম-অনুশাসন নেই, দায়িত্ব, কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা নেই । আছে শুধু ইন্দ্রিয়ের তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টি বিধান এবং খেয়াল খুশির চরিতার্থতা[১৯] । কিয়ের্কেগার্ড এ স্তরের উদাহারণ হিসাবে তিনটি ঐতিহাসিক চরিত্রের কথা উল্লেখ করেন । চরত্রিগুলো হলো , ডন জুয়ান , ফাউষ্ট এবং আহাসুরাজ[২০] । মোজার্টের অমর অপেরার ডন জুয়ান হলো আমোদ-প্রমোদ, ভোগ-লালসা এবং চরম অনৈতিকতার এক উজ্জ্বল উদাহারণ । অন্যদিকে গ্যাটের অমর কীর্তি ফাউষ্ট একজন বিকৃত মানুষ । যৌনসুখের সন্ধানে সে নৈতিকতার কোন দোহাই মানতে নারাজ । সে যৌনকর্মের সুখানুভূতির চেয়ে যৌনকর্মের পদ্ধতিতেই বেশি আগ্রহী । এবং তার প্রাপ্তি যখন শেষ হয় , তখন সে নিষ্কৃতি পেতে চায় । প্রয়োজনে তার সঙ্গীকে খুন করে হলেও । কোন ধরণের বিবেকবোধ-নৈতিকতাবোধ-বিবেচনা বোধ এখানে প্রশ্রয় পায় না । সর্বশেষ চরিত্র আহাসুরাজ একজন ইহুদি । হতাশা-জরাগ্রস্থ-নিরানন্দ একটি জীবনকে বয়ে বেড়ানোই এর বৈশিষ্ট্য । একজন ভ্রামনিক হিসাবে সে যায়নি এমন কোন জায়গা নেই , দেখেনি এমন কোন জিনিস নেই । কিন্তু স্থায়ীভাবে বসবাস করার কোন যোগ্য জায়গা তার নেই । এ ধরনের অস্থিরতা-অস্থিতিশীলতা তার জীবনে এনে দেয় ঔদাসিন্যতা-নিস্তেজ-নিরান্দনতা-একঘেয়েমিতা-বিষন্নতা-অবষন্নতা ।

জীবনের এ স্তরে যে, শুধু সুখ আছে তা নয় । এই স্তরের জীবনে দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, পুনরাবৃত্তি, ব্যর্থতা, একঘেয়েমি জনিত বিরক্তিও আছে । কিয়ের্কেগার্ডের মতে কেবল ইন্দ্রিয়ানুভূতির চরিতার্থতা এবং বিমূর্ত দর্শন চিন্তায় মগ্ন থাকলে, তা অনিবার্যভাবে মানসিক ক্লান্তি এবং অবসাদ নিয়ে আসে । অবিরত বিষন্নতা, অসহ্য একঘেয়েমি এবং পুনরাবৃত্তির ক্লান্তি একজন 'এস্থিটি'কে শূন্যতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে[২১] । তখন একজন 'এস্থিটি' নতুন করে তার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে । ভোগী জীবনের অসারতা এবং অনৈতিকতা তাকে দংশন করে । সে নতুন করে উপলব্ধি করে যে, কেবল খাদ্য, পানীয় ও আনন্দই জীবনের সব কিছু নয় । কাল তো মারা যাবই । মানুষের ভালোবাসা , আশির্বাদ, মায়া, মমতায় আবদ্ধ জীবনের সামাজিক বন্ধনেই জীবনের আসল সুখ । অস্তিত্বের আসল আনন্দ । যখনই একজন 'এস্থিটি'র এ উপলব্ধি মনের-চৈতন্যে জাগ্রত হয় , তখনই সে নতুন একটি পর্যায় পদার্পন করে । কিয়ের্কেগার্ড একে বলেছেন জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় । এটা হচ্ছে Ethical Stage বা নৈতিকতার পর্যায়[২২] ।

॥ পঞ্চম ॥

কিয়ের্কেগার্ডের মতে, জীবনের হতাশা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় জীবনের নৈতিকতার স্তর । এ পর্যায়ে কোন ব্যক্তি (এথিক্যাল) নৈতিক মূল্যবোধ এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন , বৈবাহিত জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল (একজন 'এস্থিটি' বিবাহকে মনে করে একধরনের বন্ধন বা দায়বদ্ধতা ও শৃংখল) ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, স্থায়ীভাবে কোন একটা পেশায় নিয়োজিত এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সমাজের রীতিনীতি মেনে চলতে বদ্ধ পরিকর[২৩] । কিয়ের্কেগার্ড জীবনের নৈতিক স্তরের বিবরণ দিতে গিয়ে 'দৃঢ় সংকল্প' এবং 'দায়িত্ব'-এর কথা বলেছেন । হেগেলের 'চিন্তার দ্বান্দ্বিকতা'কে কিয়ের্কেগার্ড দুর করতে চেয়েছেন 'মনোনয়নের দ্বান্দ্বিকতা' দিয়ে। নৈতিক স্তরে একজন মানুষ নিজেকে একজন সামাজিক জীব হিসাবে এবং সমাজের অংশ হিসাবে চিন্তা করে। সমাজের কল্যাণ ও মঙ্গল চিন্তা করে । সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা তার নৈতিক দায়িত্ব মনে করে । ফলে , এ কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে তাকে মনোনয়ন করতে হয় , কোন নীতি অনুসরণ করে চলতে হয় । মানুষকে বিচার করতে হয় উদ্দেশ্য হিসাবে , উপায় হিসাবে নয়[২৪] ।

কিয়ের্কেগার্ড নৈতিক স্তরের একজন আদর্শ মানুষ হিসাবে উদারণ ও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সক্রেটিসকে । কেননা তাঁর মতে, সক্রেটিসই শ্রেষ্ঠ ন্যায়পরায়ন মানুষ । মানুষ এবং মানুষের কর্তব্যের প্রশ্নে সক্রেটিস ছিলেন সদা আগ্রহী । মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনই ছিলো তার জীবনের একমাত্র এবং প্রধান লক্ষ্য । নৈতিকতাতেই সক্রেটিসের ছিলো সমান আগ্রহ । যা কিছু কল্যানকর এবং ভালো , তার কথা তিনি শুধু বলতেনই না , ব্যক্তি জীবনে তিনি তা প্রয়োগ করতেন । সক্রেটিসের সারা জীবনের কর্ম , তাঁর চিন্তা-ভাবনা, তাঁর দেয়া নৈতিক শিক্ষা-এক কথায় ইউরোপীয় সভ্যতার এক প্রধান পুরুষ সক্রেটিস[২৫] ।

এভাবে তিনি নৈতিক স্তরের স্তুতি প্রকাশ করলেও , মানুষের অস্তিত্বের অনুষঙ্গ হিসাবে কিংবা অস্তিত্বের পরিনতি হিসাবে কিংবা অস্তিত্বের সর্বোচ্চ স্তর হিসাবে ধর্মীয় স্তরকে (Religious stage) গুরুত্বায়ন করেছেন । কিয়ের্কেগার্ড মানুষের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় নৈতিকতার স্তর থেকে তৃতীয় পর্যায় ধমীয় স্তরে যাওয়ার কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন সমষ্টিকতা এবং ব্যষ্টিকতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব-জাত পাপকে । এবং এ পাপ মোছনের পর্যায় হিসাবে তিনি ঈশ্বরের নির্বিচার আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের পন্থা হিসাবে ধর্মীয় স্তরের বয়ান করেন। বিষয়টি আরো খোলাসা করে বলা দরকার । নৈতিকতা হলো সার্বিকএবং সার্বিক হিসাবে এটা সর্বকালে সবারই জন্য বৈধ । কিন্তু এ সার্বিকতাকে মানতে গিয়েই নৈতিক ব্যক্তিকে উভয় সংকটে পড়তে হয় । তার নৈতিক কাজ হলো সার্বিকতার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করা , সার্বিক হওয়ার জন্য নিজের স্বাতন্ত্রকে বর্জন করা । কিন্তু সে যদি নিজের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে প্রকাশ করে , তাহলে সে পাপ করে , কেননা সে তখন সার্বিকতা থেকে দুরে সরে যাওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয় । অন্যদিকে সে যদি নিজের স্বাতন্ত্রকে প্রকাশ না করে , তাহলে একইভাবে পাপ করে , কেননা যথার্থ অস্তিত্বের জন্য তার যা করা উচিত-সে তা করছে না , তার যা প্রকাশ করা উচত তা সে প্রকাশ করছে না বলে তখন সে অভিযুক্ত হয়। যেদিকেই সে যাক না কেন, পাপ থেকে তার রক্ষা নেই[২৬] । এ এক মহা মুসিবতের কথা । বড় মুশকিলের কথা । কিয়ের্কেগার্ড এ মুসকিল আহ্সান করার পথ বাতলে দিয়েছেন । কিয়ের্কেগার্ডের মতে , এ উভয় সংকট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ধর্মীয় জীবন । কিয়েকে গার্ড বর্ণিত 'ধর্মীয় স্তর' (Religious Stage)।

কিয়ের্কেগার্ডের মতে, ধর্মীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য হলো ‘বিশ্বাস’ ও ‘অন্তর্মুখিতা’ । আত্মনিষ্ট হওয়ার মাধ্যমে এবং মুক্ত হৃদয় নিয়ে অকপটে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে ‘বিশ্বাস’ প্রদর্শিত হয় , আর পাপ ও হতাশাকে এ বিশ্বাসের মাধ্যমে জয় করা যায় । কিয়ের্কেগার্ডের মতে , ধর্মীয় জীবন নৈতিকতার স্তরের চেয়ে উন্নত জীবন । এখানে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভই বড় কথা । নৈতিকাতার প্রশ্নও এখানে ছোট হয়ে যেতে পারে , বিশ্বাসের বৃহত্তর প্রয়োজনে । কিয়ের্কেগার্ড উদাহারন হিসাবে অর্থাৎ ‘ধর্মীয় স্তরে’ অস্তিত্বের দৃষ্টান্ত হিসাবে ইব্রাহিমের (ইসমাইল ট্রাজেডি) কথা বলেছেন । ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য মহাত্মা ইব্রাহীম কতৃক তার স্বীয় পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি দেয়ার ঘটনাটি নৈতিকতার দৃষ্টিতে অবশ্যই একটি বড় অপরাধ । কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা মোটেই বড় অপরাধ নয় । ঈশ্বরের কৃপা লাভের জন্য বা নিজের জন্য , নিজের পরিত্রানের জন্য এ ধরনের নৈতিকতা বিরোধী কাজেরও যৌক্তিকতা আছে বৈকি[২৭] । কিয়ের্কেগার্ড এ স্তরে এসেও নৈতিকতাকে একেবারে বর্জন করতে বলেননি । ধর্মীয় উদ্দেশ্যে, ঈশ্বরের নৈকট্য ও করুণা লাভের জন্য সাময়িকভাবে নৈকিতাকে স্থগিত রাখার কথা বলেছেন । তিনি বলেন , ব্যক্তি মানুষ যখন নৈতিকতাকে স্থগিত রাখে , তখন সে থাকে সার্বিকতার উর্ধ্বে , সমাজ ও সার্বিকতার চেয়ে সে হয়ে উঠে শ্রেষ্ঠ । মানুষ নৈকিতার পতাকাতলে জীবন-যাপন করবে সত্য । কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা লাভের জন্য , ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য , ঈশ্বরের তৃপ্তির জন্য যখন ধর্মের বেদিমুলে অবস্থান নেবে , তখন সে সকল প্রকার সার্বজনীনতার উর্ধ্বে -সার্বিকতার উপরে নৈতিকতার অপারে[২৮] । সার্বিক নৈতিকতার উর্ধ্বে ধর্মীয় জীবনের এ স্তরটিই কিয়ের্কেগার্ডের মতে মানুষের একমাত্র যথার্থ অস্তিত্ব । কিয়ের্কেগার্ড মনে করে , জীবনের স্তর সম্পর্কে তার বর্ণিত মতবাদের মানুষের অস্তিত্বের সব দিক অন্তর্ভুক্ত[২৯] ।

॥ ষষ্ঠ ॥

আলোচনার শেষান্তে এসে কিয়ের্কেগার্ডকে একবার সমালোচনার কাঠগড়ায় দাড় করানো যাক । কিয়ের্কেগার্ডের ‘অস্তিত্ববাদি’ তত্ত্বকে আমাদের যুক্তির মর্টেম ঘরে টেনে সামান্য পোষ্ট-মর্টেম করা যাক । কিয়ের্কেগার্ড বর্ণিত জীবনের বিকল্প অস্তিত্ব হিসাবে ‘এস্থেটি’ কিংবা ‘এথিক্যাল’ কোনটিতেই চরমভাবে স্থান না নিয়েও একজন মানুষ তার অস্তিত্বে এ দু’য়ের সহাবস্থান গ্রহণ করতে পারে । অর্থাৎ একজন মানুষের মধ্যে একজন ‘এস্থেটি’ এবং একজন ‘এথিক্যাল’ মানুষের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হতে পারে[৩০] , যা কিয়ের্কেগার্ড উল্লেখ করেননি। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে , বাস্তবিক এবং প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বিষয়টি সাফ হয় । মানুষ মাত্রই ভোগ-বিলাস প্রত্যাশি। আমরা সবাই কামনাকে তৃপ্ত করতে চাই, আকাংক্ষাকে চরিতার্থ করতে চাই এবং জীবনের একঘেয়েমিকেও এড়াতে চাই । কিন্তু এসব কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে আমরা আমাদের বিবেক দ্বারা চালিত হতে পারি । যেখানে নৈতিকতার প্রশ্ন জড়িত সেখানে নিজেদের সংযম করতে পারি। সে অর্থে আমরা ‘নৈতিক’ হতে পারি । ভোগ-বিলাসকে একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রেখে আমরা ‘এস্থেটি’ও হতে পারি । আবার, সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য-সাংসারিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেও কিংবা সামাজিক মানুষ হয়েও আমরা আমাদের আকাংক্ষাকে তৃপ্ত করতে পারি, জীবনকে উপভোগ করতে পারি । সে অর্থেও আমরা ‘এস্থেটি’ এবং ‘এথিক্যাল’ উভয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারি । কিয়ের্কেগার্ড অস্তিত্বের এ যৌথ দিকটিকে মাড়িয়ে গেছেন । অধিকন্তু, এক দাগ বাড়িয়ে আমরা একই অঙ্গে ত্রৈত রূপও দেখতে পারি । অর্থাৎ একজন মানুষ ভোগ-বিলাস-আনন্দ-ফুর্তিকে নৈতিকতার মাত্রা সীমাবদ্ধ রেখে সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে একটি সার্বিক এবং সামাজিক মানুষ হয়ে একাধারে ‘এস্থেটি’ এবং ‘নৈতিক’ উভয়ই হতে পারে। পাশাপাশি, যুগপৎ ‘এস্থেটি’ এবং ‘এথিক্যাল’ হয়েও ঈশ্বরের কৃপা লাভের জন্য ধর্ম-কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে[৩১] । সে অর্থে , একজন মানুষ ‘একের ভেতর তিন’ হতে পারে । অর্থাৎ একই সাথে তিনটি অস্তিত্বের সমন্বয় হতে পারে । কিয়ের্কেগার্ড এ বিষয়টিও বেমালুম ভলে গেছেন ।

তথাপি, একজন মানুষের সমগ্র জীবনকে পর্যায়ক্রমে ভাগ করলে আমরা কিয়ের্কেগার্ডের তত্ত্বের যথার্থতা দেখতে পাই । একজন মানুষ প্রথম জীবনে বিশেষ করে যৌবনকালে ভোগ-বিলসি হয় , অনেক ক্ষেত্রে নৈতিকতাকে অতিক্রম করে আনন্দ-ফুর্তি করে , নিজের আকাংক্ষাকে চরিতার্থ করতে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেয়। এটা ‘এস্থেটি’ স্তর । কিন্তু একটা সময় এসে বিয়ে-সংসার করে সে সামাজিক জীবন যাপন করে । সাংসারিক দায়বদ্ধতা সে পোষন করে । বৃদ্ধ বাবা-মার সেবা-যত্ন করে সামাজিক এবং সার্বিক মানুষ হয়ে উঠে । এটা ব্যক্তির ‘এথিক্যাল’ স্তর । এবং একটা বয়সে এসে মৃত্যুচিন্তা থেকে মানুষ ধর্ম-কর্মে মনোনিবেশ করে । এবং ধর্ম-কর্ম করে মানুষ আত্মার শান্তি অনুভব করে । এটা ‘ধর্মীয়’ স্তর । এভাবে আমরা কিয়ের্কেগার্ডের ‘অস্তিত্ববাদি’ তথ্যের একটি বাস্তব চিত্র অংকন করতে পারি ।

কিয়ের্কেগার্ডের ‘ফিলিস্টিন’ সম্পর্কিত ‘অস্তিত্ববাদি’ তত্ত্বের বৈঠকি বয়ানে আমরা মানুষের জীবনের কিংবা মানুষের অস্তিত্বের তিনটি স্তরের কথা অবগত হলাম । এবার তত্ত্বের দার্শনিক ভার থেকে সামান্য ছুটি নিয়ে খোশ-গল্পের মাধ্যমে হালকা হওয়ার চেষ্টা করি । গল্পের সাথে সাথে, তত্ত্বের মাপকাঠিকে নিজেদেরকে একবার মাপঝোক করে দেখি । নিক্তির ভারসাম্যতায় আমরা আমাদের চেহারা-সুরতটা একবার দেখার চেষ্টা করি। আমরা কি সবাই ‘ফিলিস্টিন’? না কেউ কেউ ‘এস্থেটি’ কিংবা ‘এথিক্যাল’ নাকি একেবারে সার্বজনীনতার উর্ধ্বে বা নৈতিকতার অপারে অন্ধ ‘ধর্মীয়’ পর্যায়ে ? বড় জটিল প্রশ্ন। তাছাড়া, আমরা ‘ফিলিস্টিন’ স্তরই আদৌ পার হতে পেরেছি কিনা সেটাই ফয়সালা হয়নি , অস্তিত্বের অন্য তিনটি স্তরের কোন্ স্তরে আমাদের অবস্থান সেটা আসছে পরের ব্যাপার । এসব গুরু গম্ভীর সওয়াল-জওয়াবের ফয়সালা বিলকুল নিজের প্রকার ও প্রকৃতির অধীন । তাই , এ তর্কের এখানেই ইস্তফা । তবে ,সাধারণ বিচারে দেখা যায় , আমরা বেশির ভাগ মানুষই ফিলিস্টিন। নিজেদের মগ্ন-চৈতন্যের মূঢ়তায় , অন্তর্গত রুচির বিকাশের অভাবে আমরা সামাজিক প্রথা পরিক্রমায় নিজেদের জীবন যাপন করি। আমরা , ‘জীবনে’র চেয়ে ‘যাপন’কে অধিকতর গুরুত্ব দিই। আমরা, ‘উপভোগে’র চেয়ে ‘ভোগে’ বেশি তৃপ্ত হই । আমরা ‘চলতে’ জানিনা , ‘চালিত’ হই । আমরা ‘দৃষ্টি’ দিয়ে দেখিনা ‘অদৃষ্ট’ চোখে দেখি। আমরা ‘মনের জোরে’ চলিনা ,‘গায়ের জোরে’ চলি । তাই , আমরা ‘ফিলিস্টিন’ । কেননা , আমরা জানিনা যে , আমরা ‘ফিলিস্টিন’ । আমরা ‘আপন’কে চিনতে পারিনা বলেই , আমরা ‘অপর’[12]’কে চিনতে পারিনা । আমরা , ‘অপর’কে চিনতে পারি না বলেই ,পর কখনো আমাদের ‘অ-পর’ হয়না । আমরা এখনো যে, ‘ফিলিস্টিন’ স্তরে অবস্থান করছি সেটাই বুঝতে পারছিনা । তাই , ভোগী স্তর , নৈতিকতার স্তর কিংবা ধর্মীয় স্তর আমাদের কাছে এখনও বহুদুর। কে জানে কতদুর? কে জানে এ হতভাগ্য ‘দুর’ কবে ‘দুর’ হবে । খুলবে জ্ঞানের দীপ্তিতে জীবনের সোনালি দোর । আসবে , অস্তিত্বের আনন্দ নিয়ে রূপালি ভোর । সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম ।

॥ হদিস ॥

---

[1] ‘লালন সঙ্গীত’ প্রথম খন্ড, সম্পাদনা : ফকির আনোয়ার শাহ (মন্টু শাহ) , লালন মাজার শরীফ ও সেবা সদন , কুষ্টিয়া , ১৯৯৩ , পৃষ্ঠা-১৯৩

[2] যুক্তিহীন বা প্রশ্নহীনভাবে মেনে নেয়া সবকিছুই বিবেকহীন ব্যাপার । অবশ্য এ স্তরে ‘আপন’ অচেনা থাকে বলে সবকিছুই বিবেকহীন বা যুক্তিহীন বা প্রশ্নহীনভাবে মেনে নেয়া হয় । কিংবা মেনে নিতে হয় ।

[3] ‘ফিলিস্টিন’-(Philistin) শব্দটির ডেনিস বানান হচ্ছে Spidsborgers. যার অর্থ হচ্ছে এমন একজন মানুষ যে ‘সামাজিক ভাবে চেতনাহীন’ । একজন ফিলিস্টিন জানেনা যে, সে যা কিছু করে, তা সে নিজে করেনা এবং সে যা কিছু সিদ্ধান্ত নেয়, তা সে নিজে নেয় না । ‘সামাজিক প্রথাপরিক্রমা’ তাকে তার গৃহিত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে বা প্ররোচিত করে । সক্রেটিসের বিখ্যাত উক্তির সাথে এখানে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় । সক্রেটিস বলেছিলেন , সে জানেনা যে সে জানেনা ।

[4] সম্প্রতি বলা হয়, চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা । ইদানিং স্বঘোষিত প্রথাবিরোধী লেখকরা বলেন , ‘যে যত বড় চোর , সে ততো বড় পন্ডিত’- পাঠক মার্জনা করবেন ।

[5] সোরেন কিয়ের্কেগার্ডকে নিয়ে বাংলা ভাষায় একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন জনাব গোলাম ফারুক *‘অস্তিত্ববাদের স্রষ্টা সোরেন কিয়ের্কেগার্ড’* শিরোনামে (অবসর প্রকাশনী , ফেব্রোয়ারী ,ঢাকা , ১৯৯৯) । জনাব গোলাম ফারুক এ গ্রন্থে সারেন কিয়ের্কেগার্ডকে সমস্ত পদ করে ‘সোকি’ শব্দটি ব্যবহার করেন । আমরাও আলোচনার সুবিধার্থে মাঝে মধ্যে সোরন কিয়ের্কেগার্ডকে ‘সোকি’ নামেই সম্বোধন করবো ।

[6] কিয়ের্কেগার্ডের পিতা প্রথম জীবনে ছিলেন একজন গরীব-দরিদ্র রাখাল । কারো কারে মতে, তিনি একদিন ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যে যন্ত্রণাকাতর হয়ে ঈশ্বরকে গালি দেন । তারই শাস্তি স্বরূপ বা প্রায়শ্চিত্য করতে সোকির পিতা শেষ বয়সে ধর্ম-কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন পাপ-মোচনের জন্য । দেখা যেতে পারে, Holmes Hartshorne-Gi ‡jLv *Kierkegard Godly Deceiver*, Columbia University Press, New York, Page-2 । আবার কারো কারো মতে, সোকি মা অর্থাৎ সোকির বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী যিনি সোকির বাবার একজন দঃসম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন, তাদের বাসায় কাজ করতেন , তার সাথে বিবাহ-পুর্ব সোকির বাবার দৈহিক সম্পর্ক ছিলো । যা পরবর্তীতে, সোকির বাবাকে অনৈতিক অনুভবে অনুতাপের আগুণে পোড়ায় । এ অনুতাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শেষ জীবনে তিনি ধর্মের পথে শাপ মোছনের চেষ্টা করেন । সোকি বিষয়টি অবগত হওয়ার পর ভীষন ভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং ভগ্ন-বিষন্ন-অবসন্ন-নিস্তরঙ্গ-নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন । দেখা যেতে পারে , সঞ্জীব ঘোষ সম্পাদিত ‘অস্তিত্ববাদঃ দর্শনে ও সাহিত্যে’ , রত্নাবলী , কলকাতা, ১৯৮৬ , পৃষ্ঠা-১১ ।

[7] *‘পাশ্চাত্য দর্শনে ইতিহাস, কান্ট-হেগেল’* , শ্রী মনোরঞ্জন বসু , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা , ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৬

[8] www.webcom.com/entries/kierkegaard-‡_‡K mÎ¸‡jv msMwnZ | BÏr ms‡¶wcZ |

[9] *‘অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা’* নীরুকুমার চাকমা , বাংলা একাডেমি , ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৪

[10] *‘অস্তিত্ববাদ’* শরীফ হারুণ , বাংলা একাডেমি , ১৯৮৯ , পৃষ্ঠা-১১

[11] ‘*An Introduction to Western Philosophy,* Ideas and Arguments from Plato to Satre’-Anthony Flew , The Boobs-Merrill Company, New York, Page-462

[12] ‘*Six Existential Thinkers*’, H.J. Blackham, Routledge, London and New York, 1994, Page-12

[13] *‘অস্তিত্বাবদের স্রষ্টা সোরেন কিয়ের্কেগার্ড’*, গোলাম ফারুক , অবসর প্রকাশনী , ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৪৮

[14] *Kierkegard Godly Deceiver* Holmes Hartshorne, Columbia University Press, New York, Page-19

[15] ‘*Republic*’, Plato, Oxford University Press, London, 1990, Book-VII-‡`Lv †h‡Z cv‡i |

[16] *‘অস্তিত্বাবদের স্রষ্টা সারেন কিয়ের্কেগার্ড’*, গোলাম ফারুক , অবসর প্রকাশনী , ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৫৩

[17] *Kierkegard Godly Deceiver* Holmes Hartshorne, Columbia University Press, New York, Page-17

[১৮] *‘অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা’* , নীর“কুমার চাকমা , বাংলা একাডেমি , ১৯৮৩ , পৃষ্ঠা-৪৪
[১৯] *‘অস্তিবাদঃ দর্শনে ও সাহিত্যে’* , সঞ্জীব ঘোষ সম্স্লাদিত, রত্নাবলী , কলকাতা , ১৯৮৬ , পৃষ্ঠা-১৯
[20] *‘Either/ Or’*, Soren, Kierkegaard , 1971, Translated by , Walter Lowrie , Princeton University Press, 1971, New York, Page-72
[২১] *‘অস্তিবাদঃ দর্শনে ও সাহিত্যে’* , সঞ্জীব ঘোষ সম্স্লাদিত, রত্নাবলী , কলকাতা , ১৯৮৬ , পৃষ্ঠা-১৯
[22] *‘Either/ Or’*, Soren, Kierkegaard , 1971, Translated by , Walter Lowrie , Princeton University Press, 1971, New York, Page-141
[২৩] *‘অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা’* , নীর“কুমার চাকমা , বাংলা একাডেমি , ১৯৮৩ , পৃষ্ঠা-৪৬
[২৪] *‘অস্তিবাদঃ দর্শনে ও সাহিত্যে’* , সঞ্জীব ঘোষ সম্স্লাদিত, রত্নাবলী , কলকাতা , ১৯৮৬ , পৃষ্ঠা-২০
[২৫] ‘সক্রেটিস’ , হাসান আজিজুল হক, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন , ঢাকা , ২০০০ , পৃষ্ঠা-২২
[২৬] *‘অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা’* , নীর“কুমার চাকমা , বাংলা একাডেমি , ১৯৮৩ , পৃষ্ঠা-৪৯
[27] ‘*Christendom*’, Soren Kierkegaard , Translaed by Walter Lowrie, Princeton University Press, New York , 1968 , Page-191
[28] ‘*The Ideological Struggle for Faith: An Althusserian Critique of Fear and Trembling’*, Jeff Sands, New York University, 1st May, 1996, দেখুন কিয়ের্কেগার্ডের অস্তিত্ববাদি দর্শন সম্স্লর্কে লিখিত ইন্টারনেট প্রবন্ধটি , www.webcom.com/entries/kierkegaard
[২৯] *‘অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা’* , নীর“কুমার চাকমা , বাংলা একাডেমি , ১৯৮৩ , পৃষ্ঠা-৫০
[৩০] *‘অস্তিত্ববাদের স্রষ্টা সোরেন কিয়ের্কেগার্ড’*, গোলাম ফার“ক , অবসর প্রকাশনী , ১৯৯৯ , পৃষ্ঠা-৫৮
[31] ‘*An Introduction to Western Philosophy,* Ideas and Arguments from Plato to Satre’-Anthony Flew , The Boobs-Merrill Company, New York, Page-465
[৩২] অস্তিত্বের অসারতা-অচেতনভাবে সামাজিক প্রথানুযায়ী পরিচালিত হওয়া এবং সামাজিক ও ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সিদ্ধান্ সমূহ যা একজন ফিলিস্তিন নিজের সিদ্ধান্ মনে করে- ইত্যাকার সব কিছুই ‘অপর’ ।

রাহমান নাসির উদ্দিন: পি. এইচ. ডি. গবেষক, কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান ও সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল : rahmannasircu@yahoo.com